বাউলসাধক লালন শাহ প্রসঙ্গে

আবদুর রশীদ চৌধুরী

মরমী বাউল সাধক ফকির লালন শাহের সমাজ-ইতিহাস, লোকায়ত ধর্ম, জনবিন্যাস, হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ সমস্যা, ফকিরি মতের উদ্ভব কথা, বাংলার গানের সজীব ধারা-বৃত্তান্ত এবং বাউল কনসেপ্টের প্রকৃত শিকড় সন্ধান করে ফিরছেন এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলাসহ সারা পৃথিবীর গবেষকরা। এখনও উন্মোচিত হয়নি তাঁর জন্ম রহস্য। তিনি হিন্দু না মুসলমান, তাঁর জন্ম কুষ্টিয়ার ভাঁড়ারায় না ঝিনাইদহের হরিশপুরে তাই নিয়েই এখনও চলছে গবেষণা, নিশ্চিত প্রমাণের জন্য। লালনের গান সঠিক উচ্চারণে, সঠিক সুরে গাওয়ার বিষয়েও অনেকের অভিমত, বিকৃতকথা ও সুর মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। লালনকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বহু গবেষক বিতর্কিত হয়েছেন। লালনকে কেউ মুসলমান, আবার কেউ হিন্দু বলার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তার সমাধান এখনও হয়নি। লালন নিজেই তাঁর জাতধর্ম বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। লালন জীবদ্দশায় তাঁর জাত-পরিচয় সম্পর্কে নিজেকে রক্ষা করেছেন। এসব প্রশ্নের উত্তরে লালন বলেছিলেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।।
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনী চিনি কীসে রে।।

বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, 'লালন ফকির শতাব্দীর ফুল।' বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীও লালন অনুরাগী ছিলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের পর কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক থাকাকালে লালন ফকিরের কিছু গান সংগ্রহ করেন। পরে তিনি কুষ্টিয়া সম্পর্কে এক পরিচিতমূলক প্রবন্ধে লালন ফকির সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী আলোচনা করে তা তাঁর অনুজ প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীকে পাঠিয়েছিলেন। মুজতবা আলী তাঁর কোনো কোনো বইয়ে লালন ফকিরের গান ব্যবহার করেছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছেন লালনকে নিয়ে। এইসব প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর 'লালন ও তাঁর গান' বইটি।

বিশিষ্ট লালন গবেষক প্রফেসর ড. আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'লালন সাঁই' পুস্তকের প্রারম্ভের মুখবন্ধে বলেছেন—সাল তারিখের হিসেব মিলিয়ে দেখলে বলা যায়, লালন চর্চার বয়স প্রায় ১৬৬ বছর। এই কাল পরিসরে লালনকে নিয়ে অনেক লঘুগুরু বই ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সংকলিত হয়েছে তাঁর গান, সংখ্যার বিচারে যা উপেক্ষনীয় নয়। দেশ বিদেশের অনেকেই লালন চর্চায় শামিল হয়েছেন— এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন আছেন, তেমনি আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়ও। আর জাত গবেষক ও নিষ্ঠ সংগ্রাহক হিসেবে মুহম্মদ মানসুরউদ্দিন ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম তো অনিবার্যভাবেই এসে যায়। উপমহাদেশের বাইরে দৃষ্টি দিলেও ক্যারল সলোমন, ম্যান্ড্রিন উইনিয়স, মাসাহিকো তোগাওয়া, ফাদার মারিনো রিগনের মতো অনেকেরই নাম মনে আসবে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশে কিংবা ভারতে লালন সম্পর্কে বই লিখেছেন, তাঁর গানের সংকলন বের করেছেন, এমন উৎসাহীজনের তালিকাও

যথেষ্ট দীর্ঘ। বিশেষ করে সত্তর দশক থেকে লালনচর্চায় নাম লেখানোর একটা প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়েছে...।'

গবেষকদের তথ্যানু রে জানা যায়, কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ বাউলগান রচনার উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলেন বাউল শ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের কাছ থেকে। লালন মাঝে মধ্যে কুমারখালিতে হরিনাথের কাঙাল কুটিরে যেতেন। অপর দিকে কাঙাল হরিনাথও ছেঁউড়িয়ায় এসে আসর জমাতেন লালনের আখড়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন লালনের গানে। যাই হোক, বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা লালনকে নিয়ে গবেষণা করেছেন, লালনকে সামনে আনার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য : ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. আহমদ শরীফ, প্রফেসর মানসুরউদ্দিন, আনিসুজ্জামান, কবি জসীম উদ্‌দীন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মযহারুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করিম, সরদার জয়েন উদ্দিন, প্রফেসর ড. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রফেসর মুহম্মদ আবু তালিব, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, এ.এইচ.এম ইমামউদ্দিন, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, বজলুল রহমান, জেড. এ তোফায়েল, আবদুল লতিফ আফি আনছ, ড. খোন্দকার রফিউদ্দিন, সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরী, এস.এম লুৎফর রহমান, আবদুল হাই, প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, রফিকুল ইসলাম, হাতেম আলী মোল্লা, মিস মীর বীনফোর্ড, ক্যারল সলোমন, ড. ম্যান্ড্রিন উইনিয়স, মাসাহিকো তোগাওয়া, আমিনুদ্দিন শাহ, প্রফেসর শরিফ হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান, মহিউউদ্দিন, মোঃ গোলাম রসুল, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, ফাদার মারিনো রিগন, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, সরলা দেবী, ক্ষিতিমোহন সেন, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, বসন্ত কুমার পাল, ভোলানাথ মজুমদার, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ড. সুধীর চক্রবর্তী, ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম, প্রফেসর সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, মোহিত রায়, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশে ভারতীয় সাবেক হাইকমিশনার মুচকুন্দ দুবে, ড. সনৎ কুমার মিত্র, চিত্তরঞ্জন দেব, ড. মতিলাল দাশ সহ আরও বহু গবেষক।

লালন বিশেষজ্ঞদের ধারণা, 'লালনের গানের সংকলন প্রকাশে সম্প্রতি যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে তার ক্ষতিকর দিকটি উপেক্ষা করা যায় না...। সেই সঙ্গে ভুল-ভ্রান্তি, জাল-নকল, অসম্পূর্ণ-বিকৃত গানে পরিপূর্ণ। ফলে লালনের আসল গানের শুদ্ধ পাঠ হারিয়ে গিয়ে নকল ও বিকৃত গান সেই স্থান পূরণ করেছে। আর দিনে দিনে কোনো প্রামাণ্য সংগ্রহ সূত্র ছাড়াই লালনের গানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই প্রবণতা বন্ধ না হলে তার পরিণাম যে কতখানি শোচনীয় হবে, তা সহজেই অনুমেয়।' লালনের জীবনকাহিনীর সব কথা জানা যায় না। 'হিতকরী' পত্রিকা ও অন্যান্য গবেষকদের মাধ্যমে জানা যায়, 'এ আত্মনিমগ্ন সংসার-নির্লিপ্ত সাধকের জীবন কাহিনী রহস্যাবৃত। তাঁর জন্মস্থান ও ধর্মগত জাতি-পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। লালন নিজেও তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে নীরব ও নিস্পৃহ ছিলেন।... লালন সাঁই ১৭৭৪ সালে সেই সময়ের নদীয়া জেলার অধীন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে (চাপড়া গ্রামসংলগ্ন) জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান লালনের জনক-জননীর নাম মাধব কর ও পদ্মাবতী। জানা যায়, লালন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। চাপড়ার ভৌমিক পরিবার তাঁর মাতামহ বংশ।... জাতি-কুটম্বদের সাথে বনিবনা না হওয়ায় লালন তাঁর মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ভাঁড়ার গ্রামের অভ্যন্তরেই দাসপাড়ায় স্বতন্ত্রভাবে বসবাস শুরু করেন। এই দাসপাড়ারই বাসিন্দা প্রতিবেশী বাউলদাসের সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গী সহ লালন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান।... তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নান সেরে গৃহে ফেরার পথে লালন বসন্ত রোগে গুরুতররূপে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সহযাত্রীরা লালনকে মৃত মনে করে এই সংক্রামক রোগের ভয়ে অতিদ্রুত কোনোরকমে মুখাগ্নি করে তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করে।... এদিকে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ ভাসতে ভাসতে কূলে এসে ভেড়ে। একজন তন্তুবায় মুসলমান রমণী জল নিতে এসে মুমূর্ষু লালনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে গৃহে নিয়ে যান।

এই রমণীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় লালন রোগমুক্ত হন। কিন্তু বসন্তরোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং মুখমন্ডলে গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়।... লালন তাঁর যৌবনের মধ্যভাগে গৃহত্যাগ করেন। সমাজ-সংস্কার-বিচ্যুত লালন জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান সিরাজ সাঁই নামক এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউলগুরুর সান্নিধ্যে এসে। লালন এই সিরাজ সাঁইয়ের নিকটেই বাউল মতবাদে দীক্ষাগ্রহণ করেন। বাউল-মতবাদে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ও নিস্পৃহ হয়ে পড়েন।... 'বাউল মতবাদে দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুর নির্দেশে লালন কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে এসে ১৮২৩ সাল নাগাদ আখড়া স্থাপন করেন।'

আবার কেউ কেউ মনে করেন, বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে লালনের জন্ম। মৌলবী আব্দুল ওয়ালী তাঁর এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে বলে উল্লেখ করেন। এই মতের সমর্থক হলেন, এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ, হরিশপুর নিবাসী সাধককবি পাঞ্জ শাহের পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দিন, ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, ড. এস. এম. লুৎফর রহমান প্রমুখ গবেষকবৃন্দ। ড. আনোয়ারুল করীমও তাঁর 'বাউল কবি লালন শাহ্' গ্রন্থে লালনের জন্ম কুলবেড়ে হরিশপুরের এক মুসলিম তন্তুবায় পরিবারে বলে উল্লেখ করেন।

তাঁদের মতে লালনের পিতার নাম দরিবুল্লাহ দেওয়ান ও মাতা আমিনা খাতুন। এই মতের পক্ষে তাঁরা হাজির করেছেন লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ্ রচিত লালন জীবনীর একটি কলমী পুথি। ঐ পুথি যে জাল সে সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মত দিয়েছেন। তবে হরিশপুরের কথিত লালন যে বাউল সাধক লালন নন সে সম্পর্কে লালনের প্রথম জীবনীকার বসন্তকুমার পাল প্রফেসর আবুল আহসান চৌধুরীকে এক পত্রে জানিয়েছেন। লালনের শেষ জীবন কেটেছে তাঁর ছেঁউড়িয়ার আখড়ায়।

'হিতকরী' পত্রিকা থেকে জানা যায়, 'এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন।'... মৃত্যুর কিছু পূর্বে এই শতোর্ধ্ব সাধক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন।... লালন ১৮৯০ সালে ১৭ অক্টোবর (১২৯৭ সালের ১ কার্তিক) শুক্রবার ভোর ৫টায় ১১৬ বছর বয়সে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।...' 'হিতকরী' পত্রিকা লিখেছে, 'মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেনাম নামও দরকার (হয়) নাই হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে।' এটিই এখন সরকারি অনুদানে স্মৃতিসৌধে রূপ নিয়েছে। মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লালন একাডেমি, লালন দিঘি, মিউজিয়াম ও অডিটোরিয়াম সহ অন্যান্য স্থাপনা। লালন যথার্থই 'শতাব্দীর ফুল'। তাই আজও দেশ-বিদেশ থেকে ভক্ত-অনুসারীরা এসে এই মরমী বাউলসাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। ছেঁউড়িয়া লালনের কারণেই আজ হয়ে উঠেছে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের তীর্থক্ষেত্র।

সহায়ক গ্রন্থ

১. মহাত্মা লালন ফকির : বসন্তকুমার পাল।
২. বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৩. ব্রাত্য লোকায়ত লালন : সুধীর চক্রবর্তী
৪. লালন সাঁই : আবুল আহসান চৌধুরী